AVA CHO

Gargi
Bhattacharya

******

COPYRIGHTED
MATERIAL

আভা চো

গার্গী ভট্টাচার্য

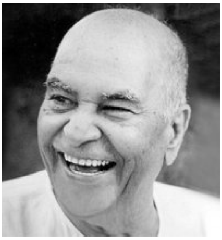

<u>পাপাজীকে ,</u>

স্পিরিচুয়াল কন্যা :: গার্গী (চন্দ্রাণী)

"The way to live a happy, beautiful life
is to accept whatever comes
and not care about what does not come."
– H.W.L. Poonja, The Truth Is.

Papaji--***Sri H. W. L. Poonja (13 October 1910 or later in Punjab, British India to***

6 September 1997 Lucknow,India)

আভা চো

আভা চো এক চৈনিক মহিলার নাম । আসল নাম হয়ত কিছু একটা ছিলো কিন্তু বিদেশে এসে সেই নাম বদলে ফেলেছে । এখন এখানে লোকে ওকে মেমসাহেব নামে ডাকে -- আভা !

আদতে ও চৈনিক কিনা তাও কেউ জানেনা ।

যার মুখে এই গল্প শুনেছি সে বলেছে যে ওকে দেখতে চীনাদের মতন কিন্তু ও আসলে কোন দেশ থেকে এসেছে সেটা কেউ জানেনা কারণ কেউ ওকে জিজ্ঞেস করেনি । হয়ত প্রয়োজন হয়নি ।

এখানে এসে ও এক Half সাহেবের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয় । সাহেব একজন বাজিয়ে । মিউজিশিয়ান যাকে বলে ।

আভা একটা অদ্ভুত যন্ত্র বাজাতো ;প্লাঁম্ ।

সেই বাদ্যযন্ত্রই এই কপোত-কপোতীকে এক নীড়ে বেঁধেছে।

এই আভা -চো, আগে যেই দেশে থাকতো সেখানে সে চুরুট তৈরি করতো। ওখানে মেয়েরাও সবাই ধূমপান করে। কেউ কিছু মনে করেনা। ওটা ওদের কালচারে আছে। একটি চুরুট কারখানায় সে কাজ করতো। সেখানে মেয়েরা সবাই- ঘন্টায় অজস্র চুরুট বানায়।

সেটা রেকর্ড বলেই মানা হয়। এক একটি চুরুট ইয়া বড় সাইজের , এক ফুট। ওপরটা দেখে টুপি বলে মনে হতে পারে। ওরা বলে :: শুরাট। ওর মা প্রথম ওখানে কাজ নেয়। ওদের পরিবারে। মাও চুরুট পান করতো।

আভারা সাত ভাইবোন মায়ের সাথেই ছিলো। কিন্তু দেশে মিলিটারি শাসন হল আর শুরু হল গণ ধর্ষণ , হত্যা ও নানান ব্যাভিচার। হয়ত সেই কারণেই ওদের মা নিজ হাতে সাত-সাতটি সন্তানকে ভিনদেশের জাহাজে তুলে দেয়। ক্রীতদাস হিসেবে। খেয়ে পরে বাঁচুক অন্ততঃ।

পেটভাতায় খেয়ে , গতর খাটিয়ে বেঁচে থাকবে। দেশে থাকলে মৃত্যু হবেই। কখনও না কখনও।

আভা বিদেশে এসে -প্লাঁম্ বাজিয়ে সময় কাটাতো । চুরুটের মতন যন্ত্র, তাতে তার বসানো গীটারের মতন । সেই তার নাড়িয়ে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি হয় ।অন্যদিকে ফুঁ দেয় । আর এই বাদ্যযন্ত্র বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় । সুমিষ্ট শব্দ ।

এই কাহিনী সবাইকে বলে **একটি গুলমোহর গাছ,** যার কোটরে পরেরদিকে আভা বাস করতো । গাছটি আগে ছিলো এক আজব দেশে । সেই দেশ, ওদের ধর্ম দ্বারা চালিত । বর্বর জাতীয় এই ডিসটর্টেড ধর্মের নাম **ফোফো চুঘতাই** ।

অসামান্যা রূপবতী **গুলমোহর গাছ** । আর সে ফোফো-চুঘতাইয়া হলেও কিন্তু ফ্রি-থিঙ্কিং করতে অভ্যস্থ । কাজেই ছিলো এক মুক্ত মনের মানবী । ওর স্বামী ওকে সোসাল কজের জন্য ত্যাগ করেন । ভদ্রলোক আসলে বিজ্ঞানী ছিলেন । ঐদেশে বিজ্ঞানের ওপরেও রিলিজিয়াস্ চাপ থাকে ।

প্রিস্ট যা চাইবে তাই হবে । যদি জলের সমীকরণ বলতে হয় **এন টু পি এইচ ৪ : N2PH4;**

তাহলে সেটাই বলতে হবে বিজ্ঞানকে অজ্ঞান করে ।

গুলমোহর গাছ তার স্বামীকে বলে বিদেশে পাড়ি দিতে । কিন্তু স্বামীজী ফতে আলি বলেন :: সবাই দেশ থেকে চলে গেলে , এত ব্রেন ড্রেন হলে দেশের কী হবে ?

সত্যি- অনেক স্কলারই তো চলে গেছেন । আমেরিকা , ব্রিটেন , ফ্রান্স এইসব দেশে । সেখানে বিজ্ঞানের নিয়ম একই । সমাজের নিয়ম অন্য । তাই ।

কিন্তু গুলমোহর গাছ যার আগে নাম ছিলো **-গুলনার,** সেই অসামান্যা মেয়েটির পতিদেব দেশ ছেড়ে যাবেন না । কাজেই ওকে একাই চলে আসতে হয় । ও একটু মুক্তমনা বলে নিয়মিত পার্টি , খোলামেলা পোশাক , মদ্যপান , ধূমপান ও নাচ করতে ভালোবাসে । কিন্তু ঐ সমাজে এগুলি অস্বীকৃত ও উচ্ছৃংখলতা বলে মনে করা হয় । ওরা মেয়েদের ; ব্যান্ডেজ ভূতের মতন আপাদ মস্তক কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে । কিন্তু তারা সবাই এত রূপবতী ! সেই রূপ না দেখালে আর লাভ কী ?

তাই গুলনার চলে আসে প্রবাসে । মুক্ত সমাজে । যেখানে এইসব জিনিসের কদর করা হয় । সবাই সম্মান পায় এখানে এবং মানুষ-- সততা , সভ্যতা আর কর্মসংস্কৃতির ওপরে জোর দিয়ে থাকে ; নানান ট্যাবু না মেনে । কাজেই এখানে এসে সে খুব ভালো আছে । তার এই জীবনে আর কিছুই চাইবার নেই বলে এখন এক মহীরুহ হয়ে সবাইকে ছায়া প্রদান করে । এক প্রকার দেহত্যাগ করেছে আর কি !

শুরুটা হয়েছিলো রেড ক্রসে কাজ দিয়ে। সেবা দিয়ে। সেই সেবিকা থেকে এখন ও একটি গাছ। এমন গাছ যা কেবল মানুষ ও পশুপাখির শীতল ছায়া নয় ; এই গাছ গল্প বলে। প্রতিটি পাতা ও ডাল তার কথা ফোটায়। জীবন্ত তাদের নীরবতা। অঙ্কুরিত হয় শিলালিপি।

এইদেশে যারা ক্রিমিন্যাল , জেল খাটে অথবা দেহ ব্যবসা ইত্যাদি করে তারা যেকোনো সময় চ্যারিটিতে যোগ দিতে পারে। কেউ প্রশ্ন করেনা ওদের।

আস্তে আস্তে তারা নিজেদের দক্ষতা ও সততা দেখিয়ে মেনস্ট্রিমে ঢুকে পড়ে। তবে এখানকার শাস্তি ব্যবস্থা একটু ভিন্ন। লোহার গরাদের আড়ালে থাকলেও যার যেটা ইন্‌সিকিউরিটি সেটা তাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। যেমন যে পোকা ভয় পায় তাকে পোকার মধ্যে ফেলা, যে অন্ধকার ভয় পায় তাকে আলোহীন সুড়ঙ্গে রাখা এইরকম।

গুলনারের স্বামী ফতে আলি বেশ ব্রিলিয়্যান্ট বিজ্ঞানী। কিন্তু হলে কী হয় ? ঐদেশে ধর্ম সব কন্ট্রোল করে।

ধর্মযাজক না চাইলে বিজ্ঞানের সত্যগুলি লোক সমাজে প্রচার করা হয়না। কাজেই পৃথিবীর বুক থেকে জল কমে যাচ্ছে এই তথ্য ঐদেশে অনেকেই জানে না।

ফতে আলিসাহেব যে সেই কারণে আলোক রশ্মি দিয়ে স্নানের আয়োজন করেছেন এবং তার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র নির্মাণ করেছেন তা চাপা পড়ে গেছে ধর্মের কারণে। এই আলোক ছটা, ঐ যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে বসলেই নিজে থেকে বিচ্ছুরিত হবে। আর দেহ সাফ হয়ে যাবে কোনো জল ছাড়াই। এতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়না। আলোর রং আছে। গাঢ় লাল। অনেকটা রক্তের মতন। যন্ত্রটি- অনেকটা আধুনিক বিমান বন্দরের টয়লেটের মতন, ছোট খোপ কাটা।

দেহ ; ক্লিন করে লিম্ফ গ্ল্যান্ড। প্রাকৃতিক উপায়ে। তাই লিম্ফ-গ্ল্যান্ডের অনুকরণে নাম দিয়েছিলেন ::: লিম্ফিস্তিমা। কিন্তু ধর্মের কারণে ঐ যন্ত্র, মানব সমাজের সম্মুখে আনা হয়নি। ওরা মনে করে জল পবিত্র। অন্য কিছু দিয়ে দেহ সাফ হবেই না !

ফতে আলিসাহেব এখানেই থেমে থাকেন নি । উনি ব্রেনের নতুন কিছু এরিয়া লোকেট করেছেন যেখান থেকে মানুষের মাথায় এইসব কুসংস্কারের ভূত চেপে বসে । ঐসব এরিয়ার কথা আগে বিজ্ঞানীরা জানতেন না । একটি বিশেষ হরমোন যার নাম উনি দিয়েছেন **কার্স** , সেই হরমোনের কারণে ঐ অংশ অ্যাক্টিভেট হয় এবং মানুষ, পশুর মতন যুক্তিহীন আচরণে আবদ্ধ হয় । ধর্মে কেন এটা করতে বলা আছে সেটা লজিক দিয়ে না ভেবে অন্ধ অনুকরণ করতে শুরু করে ।

অর্থাৎ এটা একপ্রকার অসুখই । ফতে সাহেব মনে করেন যে জগতে নাস্তিকেরা আছেন বলেই সমাজে শ্বাস নেওয়া যায় । নাহলে এই ভন্ডের দল, নানান যুক্তিহীন অনুশাসনে বেঁধে মানুষকে কচুকাটা করতো ।

সুতরাং বোঝাই যায় যে তার আবিষ্কৃত এইসব বস্তু লোকসমাজে চর্চিত হবেনা কখনই । তবুও দেশের ও দশের কথা ভেবে উনি ঐ দেশেই রয়ে গেছেন ।

গুলনার এখানে এসে মুক্ত-মেয়ে হয়েই আছে ।

প্রথমে অপরূপ শরীর দেখাতো । স্ট্রিপিং করতো । নিজ নগ্নদেহ, বিকাতো লোকসমাজে । এক এক করে নিজ বস্ত্র খুলে নিজেকে মেলে ধরতো পুরুষদের

সামনে । ইদানিং লেসবিয়ান মানুষও আসা শুরু করে । কাজেই ক্লায়েন্ট বেড়েছে । কিন্তু সেইরকম এক মহিলা ক্লায়েন্ট- যে একটি ব্যাঙ্কে লোন অফিসার ছিলো তারই উৎপাতে কাজ ছাড়তে হয় । মেয়েটি সমকামী কেউ জানতো না । আর তাই ওকে মলেস্ট করলে কেউ বিশ্বাসও করতো না । ওর ন্যাংটো শরীরটা নিয়ে যাচ্ছেতাই করতো , ওর পিছুধাওয়া করে টয়লেটেও চলে যেতো । গোল গোল চোখ করে বলতো :: তোমাকে আমি চুষবো , চাটবো ।

শেষে ও কাজ ছেড়ে দেয় । অনেক বছর তো এসব করলো । এখন প্রায় চল্লিশের কাছে । যৌবন ঢলে যেতে যেতে ও নিজেও চলে যেতে চায় ।

হরমোন ইঞ্জেকশান নিয়ে বস্ত্রহরণের খেলায় মাততে চায়না । হয়ত তাই রেড ক্রসে, সমাজ সেবার কাজ নেয় । আর এখন বৃক্ষ হয়ে সবাইকে শীতল ছায়া দেয় । মেটামরফসিস্ । মেটাফোর্ । মেসমারাইজিং ।

ফসিল ফসিল ফসিল । ওর চেতনা ফসিল হয়ে গেছে ।

সে নিজেই আভা চো-র গল্প বলে সবাইকে । আভা চো নাকি আগে খুব মাংসাশী ছিলো । পর্ক ও ডিম খেতো । হুইস্কি পান করতো ; তারও আগে ভাত পচানো দেশী মদ । আর খুব স্মোক করতো । এখন বদলে গেছে ।

আভা চো-র স্বামীর এটা তৃতীয় বিয়ে । প্রথম স্ত্রীকে বিয়ে করে যখন ওরা দুজনেই মাত্র ১৫ । ম্যাকডোনাল্ডের টয়লেটে সেক্স করতো । বাড়িতে কেউ ওদের স্বীকার করেনি । তাই । স্ত্রীর ভীষণ মুখ খারাপ ছিলো । প্রোফ্যানিটিতে ডক্টরেট । ১৮ বছর বয়স হলে দুজনে একসাথে থাকা শুরু করে । দুই মেয়ে হয় ।

বৌটি কাজ নেয় রিয়ল এস্টেট এজেন্ট হিসেবে । আর আভা চো এর স্বামী, টক্সিক কেমিক্যালের কারখানাতে কাজ নেয় । এইসব এরিয়াতে বেশি লোক যেতো না তখন, প্রাণ ভয়ে । কাজেই কমোডিটি ট্রেডার হতে সময় লাগেনি তার । সমাজে আমরা যাকে বিষ মনে করি , মগনলাল মেঘরাজের মতে :: বিস্ খুব খারাফ জিনিস্ আছে !

সেই বিষই এদের কাছে অমৃত । বিষ যেন খুব তাড়াতাড়ি- ওদের ধনসম্পদ ঢেলে দিয়েছে । আজকাল কোথায় না বিষ লাগে ? মারণাস্ত্র থেকে শুরু করে গৃহস্থের রোজনামচা--সর্বত্র । তাই সমুদ্র মন্থন করেই সেই বিষ ধারণ করেছে নিজ কন্ঠে, আমাদের ক্ষ্যাপা দেবতা , শিবশম্ভু নন স্বয়ং আভা চোয়ের স্বামী :: **দাফা তেগু চো ।**

প্রথম স্ত্রীকে ভালোবাসলেও সে ওকে ছেড়ে অন্য পুরুষে যায় । এক ফ্রেঞ্চম্যান । আদ্রিয়ান । পেশায় নাবিক । নানান দেশে ভেসে বেড়াতো । বন্দরে বন্দরে বৌ কিনা **দাফা তেগু চো** জানেনা । তবে নিজ বৌ খোয়া গেলো, আদ্রিয়ানের কল্যাণে । দুই মেয়ে নিয়ে এক ধূসর গোধূলিতে, হাওয়া হয়ে যায় ওর বৌ । এখন সবাই তাকে পত্রিকায় দেখে । ম্যারেজ কাউন্সিলার হিসেবে খুব নাম করেছে কিনা ! রিয়ল এস্টেটে আর নেই । তবে ওকে দেখানোর জন্যেই বোধহয় আমাদের দাফা তেগু চো এক বিশাল টাওয়ার নির্মাণ করে । **চো টাওয়ার** । যেখানে সে বেঁচে থাকাকালীন আভা থাকতো । এখন বেরিয়ে এসেছে বাণপ্রস্থে ।

প্রথম বৌয়ের দুই সন্তানকে পেলেছে **দাফা তেগু** নিজেই । বৌয়ের কাছে ছিলো ওরা কিন্তু চো নিয়মিত টাকা দিতো আর দেখাও হত । কারণ ওরা ওর নিজের মেয়ে

আর আদ্রিয়ান, পরে কোনো কাজ করতো না । নিজ দেশে থাকতে, সে নাকি খুব কর্মঠ ছিলো । তাই নাবিক হয় । অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছিলো । পরে বিদেশের কোনো দেশে ; সম্ভবতঃ ভারতে , সে থর মরুপ্রান্তে মানুষকে জল সরবারহ করতো । গিয়েছিলো ওখানে কাজ নিয়েই । কিছু গ্রামের মানুষ নানান শস্য যেমন বাজ্‌রা, সর্ষে , মূলো ইত্যাদি চাষ করতো শুষ্ক মরুতে । সেই শস্য বাজারে বিক্রি করে দিন কাটাতো । তাদেরই ছেলেপুলেদের লেখাপড়া করানোর জন্য সরকার অনেক স্কুল খোলে । মজার ব্যাপার হল এখানে মাইনে নেই । থাকা ও খাওয়া-পরা ফ্রি ।

বদলে সরকার উটের ভরণ পোষণ করতে বলতো । সপ্তাহে তিনদিন স্কুল খোলা থাকে । বাকি সময় উটপালন ।

হাতে মাইনে না পেলেও এখানে মাসে একবার করে বিরাট লটারি হত । সেখানে প্রায় সবাই কম করে ১০০০ টাকা পেয়ে যেতো । টিকিট কাটলেই ১০০০ টাকা । তাই হয়ত আদ্রিয়ান ওখানে জল ফেরি করতো । ওর জল থাকতো মহাসাগরে । সেই অলীক জল, বালি মাখা হলেও অসম্ভব মিষ্টি ও শীতল ।

ধূসর, রুক্ষ্ম মরুতে এই জলের উৎস হল নাবিক আদ্রিয়ানের **মন সমুদ্র** । সমুদ্রে অঢেল জল । কোনো

শেষ নেই । লহরী কেবল নোনা । নুন তরঙ্গ । তাই হয়ত বা এতগুলি সমুদ্র ও মহাসমুদ্র থাকতেও আজ দুনিয়ায় জলের আকাল । নিজের মুত্র নিজেকেই পান করতে হচ্ছে স্রেফ জলের অভাবে । পরিবারের সবাই মুত্র ত্যাগ করে জলের পাত্রে । কলসে, জগে, ওয়াটার বটলে । সেই প্রস্রাব পান করে নির্দ্বিধায় , সবাই । কারণ উপায় নেই । শাস্ত্রে যখন বলা হয়:: **অতি লোভে তাঁতি নষ্ট** ; তখন পন্ডিতেরা বাঁকা হাসি দেন। বলেন :: ওসব ওল্ড আইডিয়া ।

এখন বাথরুম উঠে গেছে । প্রতিটি মুত্রকণা এখন মূল্যবান । সবাই :: বাঞ্ছারামের মতন :: **এই নাও শিশি, এতে ধরে রাখো হিসি** ফিলোসফি মানতে বাধ্য হচ্ছে ।

তাই -সামুদ্রিক নুন ছেঁকে নিতো আদ্রিয়ান তার মন কলসে । তারপর জল সরবারহ করতো দগ্ধ প্রান্তরে । নির্মল জল । আজকাল বিজ্ঞাপনের যুগ ।

লেখা হত :: জলের স্বাদ ফিরে এলো ।

কিংবা : ড্রিংকিং ওয়াটার -ফ্রম টয়লেট টু সি বিচ্

মাঝে তো বাথরুম অনেকটাই মন্দিরে পরিণত হয়েছিলো !

পরে সেই মানবদরদীই এসে, দাফা তেগু চোয়ের প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে চম্পট দেয় । শেষে দাফা তেগু, এক অন্য নারীতে যায় । তাকে বিয়েও করে । নাম তার ইলিয়া । ইলিয়া, দাফার চেয়ে অনেক ছোট । কুতকুতে চোখ । উন্নত নাসিকা । সোনালী চুল । কেমন যেন আল্‌নার মতন দৈহিক গড়ণ তার !

অনেকগুলি সন্তান হল তো ওর । কিন্তু বেশিরভাগই মারা গেলো । লোকে বলে, ওদের বাবাই ওদের হত্যা করেছে । মায়ের গর্ভে । বাচ্চা হবে শুনলেই ওকে অ্যাবর্ট করাতো দাফা তেগু । পরে অবশ্য তিন সন্তানকে গ্রহণ করেছে লোকটি । আগেরগুলি সবই মায়ের পেটেই মারা গেছে ।

আজকালকার বাচ্চা তো ! জন্মের আগেই বাবার সব ব্যাভিচারের কথা, টুইট্‌ করে গেছে ।

ইন্সটাগ্রামে ফটো দিয়ে গেছে কীভাবে ওদের অ্যাবর্ট করছে দাফা তেগু । সারা দুনিয়া দেখছে !

এতগুলি সন্তানকে নৃশংসভাবে গর্ভে, হত্যা করেছে বলেই কিনা কেউ জানেনা দাফা তেগুর দ্বিতীয় বৌ পালিয়ে যায় । তারপর আভাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে, বাজনার জন্য । ওর সৎ সন্তানেরা, ওকে মা হিসেবে গ্রহণ করে । শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসতো । বলতো : : সি ইজ অ্যান অ্যামেজিং মাদার !

কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে, **চো টাওয়ার** ছেড়ে আভা বেরিয়ে আসে । কোনো ঝামেলা না করেই । বলতো : : আমার সাংসারিক জীবন শেষ হয়ে গেছে ।

বাইরে এসে, ঐ গুলমোহর গাছের কোটরে থাকতো । আগে অরণ্য থেকে কাঠ যোগাড় করতো । কাঠগুলো লোকে সস্তায়- জ্বালানি, ফায়ারপ্লেসের কাঠ হিসেবে কিনে নিতো । এখন বয়স হয়েছে বলে ও মাটির জিনিস বানায় । কুমোরদের মতন । অল্প কাজ করে । ওর একার চলে যায় । নিজে মাস্টার চুরুট বাঁধিয়ে হলেও ওসব আর করেনা । স্বাস্থ্যকর নয় বলে ।

মাটির জিনিস বায়ো ডিগ্রেডেবেল । দেখতেও ভালোলাগে । মাটির সুগন্ধ লেপ্টে থাকে প্রতিটি কণায় ।

বুড়ো বয়সে মাটির কাজ শিখে নিয়েছে আভা চো । যে চৈনিক কিনা তাই নিয়ে লোকের মনে সংশয় আছে ।

তবু তাকে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন করেনা !!

কারণ তাতে কিন্তু সত্যি কারো কিছুই যায় আসেনা ।

বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করা আভা চো, থাকতো গুলমোহর গাছে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে। এখন মাটির রূপকার। ওর স্বামী নেই। মারা গেছে। আভা বলতো গুলমোহর গাছকে ::**আমি আর কাকে বাজনা শোনাবো ? কী করবো ঐ মহলে থেকে ? মহলে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। ওখানে পুতুল আছে , মানুষ নেই। কেন মানুষ পুতুল হয়ে যায় ? কেন সমুদ্র মন্থন করে শান্তিবারি নিয়ে আসা মরুমানুষ হঠাৎ অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পলায়ন করে ? কেন নিজ বা আত্মীয় সন্তানকে এক এক করে হত্যা করে, মামা কংসের মতন কোথাও, কেউ ?**

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় মনে হয় একটা চোর অন্ততঃ আসুক। মানুষ নেই। জনমানবহীন প্রান্তরে একটি বন আর গুলমোহর গাছ। সেখানে বাস করে আভা চো নামে এক ধনী ব্যবসাদারের প্রিয় স্ত্রী , সৎ বাচ্চাদের একান্ত আপন মা। মাংসাশী আভা এখন নিরামিষ খায়। চা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি এক আচার আর মোটা রুটি। সেই রুটি আগুনে শেঁকে নেয়। বড় বড় আটার দলা হাতে চেপ্টে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় আগুনে। পুড়ে তৈরি হয় রুটি। চা পাতার আচার আর বুনো

শিম্, ঝিঙে জাতীয় সবজি, নানান বুনো শাক্ ও কচু খেয়ে দিন কাটায় আভা চো ।

নিজের পূর্বাশ্রমের কথা বড্ড মনে পড়ে । দিনান্তের ফিকে আলোয় বসে । গুলমোহর গাছ তখন কথা ঝরায় । সুরবাহারে প্রাচীন তান ।

ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স , চুরুট কারবারি মায়ের বিচ্ছেদ- তার বাবার সাথে , মায়ের নিজ হাতে সব সন্তানকে ক্রীতদাস করে বিদেশে প্রেরণ - এক এক করে মনের স্ক্রীনে ভেসে ওঠে । সত্য হজম করাই সবচেয়ে কঠিন । রিয়েলিটি সবচেয়ে শক্ত । হীরে কিংবা প্ল্যাটিনামের চেয়েও । জীবনটা কারো স্কেচ করা নয় । এক অজানা স্ক্রিপ্ট । শুধু অভিনয় করে যেতে হয় শেষ অঙ্ক অবধি । এই নিয়ম জগৎ সংসারের ।

আভা নাকি বলতো ::: **আমি তেমন কাউকে আমার জীবন নিয়ে লিখতে দেবো যে একটি সরলরেখায় আমার জীবনী লিখতে সক্ষম । পয়েন্ট টু পয়েন্ট । পোভার্টি টু পোভার্টি ।**

কথায় বলে :: মর্নিং শোস্ দা ডে ।

এগুলি আভার জীবন দর্শন । ওর মা চুরুটের মতন প্রাণ নাশ করে এমন জিনিসের কারবারি । ওর বাবা ছিলো শিকারী যে অকারণে বন্য পশু শিকার করতো নিছক মজা দেখার জন্য । আগে শিকারে সাহায্য করতো । গাইড হিসেবে । রাজা গজাদের । পরে নিজে পোচিং করা শুরু করে । আর এদিকে আভার স্বামী তো তার সিংহভাগ সম্পত্তি গড়েছে বিষাক্ত বস্তু কেনাবেচা করে । কমোডিটি ট্রেডার অফ টক্সিন ।

বিষ ব্যবসায়ী । বিষ কেনাবেচা করে জীবন কাটায় । কারো কাছে যা বিষ ওর কাছে তা অমৃত । গরল নয় । অমৃত , গরল এসব তো আমাদের মনে । সাপের বিষ যাকে বলো তা তো সাপের নিজস্ব । গরল নয় । কত বিষবৃক্ষ , বিষ ছড়ায় । সেগুলি গাছের আত্মজ । আমাদের বিষ ।

কপাল কুন্ডলাও তো কারো না কারো মেয়ে ?

আচ্ছা , আভা চো সম্পর্কে পাঠকেরা কী শুনতে চায় ? কী ভাবছে ?

আমি যা ভেবেছি সেটা হল এই যে আভা কোনো সাধারণ রমণী হতেই পারেনা । স্রষ্টারা শুধু চরিত্র গাঁথেন না , চরিত্রকে পথ দেখান । আমি মাটির জিনিস বানাই না , মাটি-শিল্পী নই আমার চরিত্রের মতন । ইন্‌ফ্যাক্ট আমি মাটিতে ঘৃণায় হাতই দিইনা ! তাই আমার রক্তমাংস দিয়ে গড়া **আভা চো** হবে ঠিক এইরকম --------------!

আভা চো নিজেকে শান্তি দিতে রং জোছনায় ডুবে যায় । অর্থাৎ কালার থেরাপি করে । সুন্দর সুন্দর রং দিয়ে মাটির কলস আঁকে । তার গায়ে রঙীন , রঙ্গোলি বানায় । আর সেই রং মানুষের চেতনায় আনে ঠান্ডা ভাব । যখন কাউকে সে মাটির পাত্র বিক্রি করে তখন মোলায়েম হাতে স্পর্শ করে ক্রেতার দেহ । আর রং চং মাখা পাত্রটি হাতে নিয়েই ক্রেতা ডুবে যায় এক অমল শান্তির পারাবারের ।

মাটি যেমন পুড়ানো হয় সেরকম আভা নিজেও নিজেকে আগুনে পোড়ায় । প্রতি সপ্তাহে , একবার করে । এতে তার দেহ পোড়ে না । মনটাকে পোড়ায় ।

দেহ একইরকম থাকে । কাঠকুটো জুটিয়ে নিজেই নিজের চিতা তৈরি করে । তারপর তাতে অবগাহন করে। মন পুড়ে গেলেই উঠে আসে ; আগুন থেকে ।

চারিপাশে ভস্ম থাকে । আভা কিন্তু পোড়েনা ।

শুধু প্রতি সপ্তাহে, পাখির ডানায় উড়ে আসা সভ্যতার ভেজাল যা ওর মনে বাসা বাঁধে তাকে পুড়িয়ে ফেলে ।

খুব অদ্ভুত তাই না ? **আভার প্রথম প্রেমও আজব ।**

আকাশের চাঁদ ওর ফার্স্ট ফ্লেম । পূর্ণিমার চাঁদ ।
ওদের দেশে বলতো :: পৌর্নিম্ ।

সেই তার ফার্স্ট-ক্রাশ্ ।

সেই আভাই একদিন হঠাৎ মারা গেলো । আগুনে পোড়ে তার মন , দেহ নয় । তাই ওকে কবর দেওয়া হবে সম্ভবতঃ। আভার মৃতদেহের ওপরে ঘুরে বেড়ায় অজস্র মাছি নয় , চিন্তার রেখা । চিত্র । ওর বাবার জীবন । মায়ের কষ্ট ও ভাইবোনেদের নিজস্ব জীবন যাপন । আমি কেবল ওর বাবার জীবন-যুদ্ধটাই দেখতে পেলাম, আতসকাঁচ দিয়ে ।

আশ্চর্য চেতনার স্ফুরণ ।

আভা চোয়ের বাবার জীবন । অদ্ভুত মানুষ ছিলো সে ।

আভাদের গ্রামে সবাই পালোয়ান । পুরুষেরা । বংশ পরম্পরায় তারা পালোয়ান-গিরি করে কাটায় ।

ছোট থেকে কুস্তি করা , দেহচর্চা , লাঠি খেলা ইত্যাদিতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে । পরে বিভিন্ন শহরে ওরা বাউন্সারের কাজ করে । অর্থাৎ বডিগার্ড । নতুন প্রজন্মের সবাই, নানান প্রফেশনের হাতছানি এড়িয়ে বাউন্সার হতেই চায় । সবাই ম্যানলি, বডি বিল্ডার আর ব্যায়ামবীর কিন্তু ওরা কর্মী , অ্যামেচার নয় ।

আজকাল হৃদরোগ আর সুগারের যুগে সবাই ফিট থাকতে চায় । জিম করে নিয়ম করে, শখে নয় । কিন্তু

এই গ্রামের সবাই আখড়ায় যায় ছোট থেকেই । যখন দেহে বাসা বাঁধেনি কোনো অতিরিক্ত মেদ কিংবা চর্বি । ওরা কুস্তির সঙ্গে ভারোত্তলন আর যোগব্যায়াম করে । খায় পরিমিত মানে ওদের যা প্রয়োজন সেইরকম । সফেন চালের ভাত, থক্থকে ডাল, ছানা , রাজ্মা, কলা , খাঁটি দুধ, মাংস, ডিম, ফলমূল এইসব খায় । ওরা মদ, সিগারেট পান করেনা ও ড্রাগস্ নেয় না । এমনকি সাপের ছোবলও নেয় না নেশার জন্য (**snake venom)** --একদম ফিট্ বডি !

ওরা পর্ণো দেখেনা, নগ্ন নারীদেহে হাত বোলায় না । মনের দিক থেকেও একদম নির্মল ! বড় বড় শিলাখন্ড, লোহার বল, বিশাল যন্ত্র তুলে দেহচর্চা করে । নিজেদের কাজ নিয়ে গর্বিত । কারণ ওদের জন্যই আধুনিক হিংসার যুগে, বড় বড় মানুষেরা সুখে থাকতে পারেন ও কাজকম্মো করতে সক্ষম ।

ওদের গ্রামে প্রচুর বাঁশবন । বাঁশগাছ । সেই বাঁশ ওদের কাজে লাগে । জলোচ্ছ্বাসে ভরা নদীর নামও বাঁশমণি । আরেকটি ঝিল আছে তার নাম বাঁশরি।

ওরা তুলসী গাছের মতন বাঁশগাছকে মনে করে পবিত্র । বাঁশগাছের পুজো করে । বাঁশের উপকারিতা নিয়ে

এতই সরব ওরা যে বলা হয় ::যেখানে বাঁশগাছ নেই সেখানে মানুষ নেই ।

ওরা খুব বাঁশিও বাজায় । সেই সুরে পেখম মেলে নেচে ওঠে ময়ূর । রামধনু রং এর আবার সাদা ময়ূরও ।

কাজেই আভার বাবাও আগে বাউন্সার হয়েই কাজ করতেন এক বড় শহরে । সেখানে এক প্রাক্তন দেহপসারিনী, হাই প্রোফাইল ক্লায়েন্টদের সিউকিউরিটি সাপ্লাইয়ের কোম্পানি চালাতো । কাজ করতে করতেই এক যুবরাজের নজরে পড়ে আভার বাবা ঘাসিলিং ।

সেই যুবকের শখ ছিলো বেয়াড়া শিকার , ফাস্ট রেসিং কার ও জুয়া । ভদ্রলোকের বডিগার্ড হয়েই শিকারের নেশায় পায় ঘাসিলিং-কে । ছুটিছাটায় বনে যেতো ওরা । নিরীহ পশুদের হত্যা করতো নেহাতই মজা দেখার জন্য । তারপর বুনো শূকর , হরিণ ইত্যাদি পুড়িয়ে খেতো । সবাই মিলে । নিয়মিত এরকমভাবে নির্মল কতগুলো পশুকে বিনা কারণে মেরে খেলা করার জন্য আভার মা প্রথমদিকে ওর বাবার খুব সমালোচনা করতো । বারণ করতো । পাপ করতে না করতো । --অসহায় জীব, অবলা জীবদের কেন মারো তুমি ?

--ওটা আমার নেশা ও পেশা । ওরা আমার মালিককে আক্রমণ করতে পারে ।

আভার মা জানতো যে এটা অসত্য । পশু শিকার ওর বাবার পেশা নয়, নেশা হয়েই গেছে । মদের নেশার মতন । অনেকবার বারণ করেও শিকার বন্ধ করা যায়নি ।

আভার মা তো চুরুট বাঁধিয়ে ছিলো । তাই পশুহত্যা নিয়ে সরব হলেও ওর নিজের কাজও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মন্দ বলে হয়ত ভেতরে ভেতরে একটু মিইয়ে থাকতো । শেষকালে অবশ্য এই শিকারের নেশার জন্যই ওর বাবা ও মা আলাদা হয়ে যায়- ভিন্নমতের কারণে ।

--চুরুটের ধোঁয়াও মানুষ মারে । আমি পশু মারি আর তুই মানুষ মারিস্ ! বলতো আভার বাপ্ ।

--তুই খুনী ; তুই বেশি পাপ করছিস্ । তোর নরকেও ঠাঁই হবেনা । আমি পশুদের একবারে মারি বলির পশুর মতন এক কোপে । আর তুই ধীরে ধীরে প্রাণ নিস্ । ওরা জানেও না যে তুই ওদের হাতে চুরুটের নামে বিষতীরের ফলা তুলে দিস্ ! ওদের বলিস্ যে তোরা নিকোটিন কম আর ভেষজ বেশি দিস্ আর তাই শুনে ওরা বেশি করে কেনে কিন্তু আমি জানি যে তোরা আসলে ওতে ড্রাগ্স্ মেলাস্ ।

তারপর শুরু হতো বাউন্সারের অত্যাচার । মার । মেরে ওর মাকে শুইয়ে দিতো ওর বাবা, ঘাসিলিং । পুরো ১০০ শতাংশ যোগব্যায়াম আর কুস্তির বিদ্যা প্রয়োগ করতো পত্নীর দেহের ওপরে । যেন বৌ তার অপোনেন্ট !

বলতো :: এবার শুধু শিকার নয় , তোর হাড় দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো।

আভার মা আলাদা চলে যায় । পরে সন্তানদের ক্রীতদাস করে পাঠিয়ে দেয় দূরদেশে । কীইবা করবে সে ? এতগুলি সন্তান নিয়ে একার রোজগারে কি চলে ? তাও স্বল্প কিছু আয় দিয়ে ?

বরং অন্যদেশে গেলে বাচ্চাগুলি বেঁচে-বর্তে থাকবে !

এইরকম ভায়োলেন্ট পরিবারের মেয়ে আভা চো ।

যে চৈনিক কিনা কেউ জানেনা ।

স্বেচ্ছাচারী, পালোয়ান ও মুডি বাবার জীবনটাও একটা জীবন বটে ! মনে হয় আভার । তাই হয়ত আভা ওর বাবা, চুরুট বাঁধিয়ে মা ও বিষ ব্যবসাদার স্বামীর ভুলের মাশুল দিচ্ছে এইভাবে কালার থেরাপি করে ও মাটির

ইকো ফ্রেন্ডলি বস্তু বেচে । ওর বংশের ব্যালেন্স শিটে কিছু পুণ্যর এন্ট্রি করছে ।

আভার মৃতদেহর পাশেই দুলছে ওর আত্মা । একটি দোল্‌নায় । গুলমোহর গাছের কাছে বাঁধা একটি দোল্‌না । সেখানে ঝুলন্ত, আভার চেতনা । কনশাস্‌নেস্‌ । দর্শনে বলা হয় যে আমাদের শরীরের মধ্যে আমাদের মন -এই ধারণা ভ্রান্ত । আসলে আমাদের মনের অন্দরেই আমাদের দেহ । দেহও আরেকটি থট্‌ । সলিড থট্‌ । তাই বুঝি দেহ গেলেও মনটা দুলছে ঐ দোল্‌নাতে । চেতনা ঝুলে পড়েছে !

আর ফুলঝুরির মতন চিন্তার স্ফুলিঙ্গ এদিক ওদিকে ভেসে যাচ্ছে । তারাবাজি । আমাদের মন আসলে তারাবাজি । পুড়তে পুড়তে একসময় অবিনশ্বর আলো হয়ে যায় । শেষ স্ফুলিঙ্গ উড়ে গেলেই !

পাঠকের কি জানা আছে যে প্রতিটি চরিত্রের জার্নি, রক্তমাংসের মানুষের জীবনযাত্রার চেয়ে কিছু কম আকর্ষক নয় ? আর তাই হয়ত ক্যারেক্টরদের ঠিক ততটাই ফ্রিডম্‌ প্রাপ্য যতটা মানুষের নিজের ! লেখকের এত স্পর্ধা কোথার থেকে আসে যে ওদের

রেখাবন্দী করে ফেলে ? তাই বুঝি ,চরিত্ররা স্বাধীনতার লড়াইয়ে নেমেছে ! ওরা চাইছে- ওদের প্রতিটি ডায়মেনশান যেন খুলে রাখা হয় । ওরা স্রষ্টার তুলিরেখায় বাঁধা থাকতে অনিচ্ছুক । ওরা ফ্রি -স্পেস চায় । তাই আমি আভাকে এতটা ফ্রিডম্ দিচ্ছি । এখানে আমার ইগোর চেয়ে আভার ইগোকে আমি বেশি সম্মান দেবো । আমি ওকে আবার গড়ে তুলবো, হ্যাঁ- এই একই নভেলায় ! অণু উপন্যাসের বিচ্ছুরণে ।

স্পেক্ট্রামের আভা সে এখন । আকরিক বর্ণালি !

আভার বাবার একটি পাতানো পুত্রও ছিলো । তার নাম পানাদা। তাকে- বছরখানেক বয়সে ,বনে কুড়িয়ে পেয়েছিলো ওর বাবা । লোকে অবশ্য বলে যে সে আসলে আভার বাবারই অবৈধ সন্তান । কার গর্ভে সে জন্মেছে সেটা কেউ জানেনা । ওর মা ঐ ছেলেকে নিজের সংসারে রেখেছিলো । পানাদা ভালো মানুষ । সহজ সরল ছেলে । আগে তো বনে, ও হাতির সাথে বেড়ে উঠেছিলো । একটি হাতির পালের সাথে । কটি বাচ্চা হাতিও ছিলো । পরে ওদের নিয়ে গেলো লোকেরা, কতগুলি মন্দিরে রাখবে বলে । ওদের দেশে ধর্মস্থানে হাতি ছিলো । যদিও মিলিটারির শাসনে এগুলি বন্ধ করার চেষ্টা হয় তবুও কিছু কিছু

প্রভাবশালী , বর্ধিষ্ণু পরিবার তাদের প্রাইভেট মন্দিরে একটি করে হাতি রাখতো । সেই হাতি রোজ দুইবেলা ভক্তদের মাথায় শূঁড় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করতো । মন্দিরের মোটা ইন্‌কাম হতো কারণ ভক্তরা এর বদলে টাকা দিতো ।

অনেকে বলতো যে জংলী হাতির কী অধ্যাত্মিক শক্তি থাকতে পারে তা ঈশ্বরই জানেন !

পানাদা ; বনে হাতির সাথে বেড়ে ওঠায় ওকেও নিয়ে যায় মন্দিরের লোকেরা । ও সেখানে হাতির দেখাশোনা করতো । কারণ ওকে হাতিটি, শৈশব থেকে দেখেছে ও চেনে । হাতি খুব বুদ্ধিমান পশু । তাই পরিচিত মাহুত হলে সুবিধেই হবে । কাজেই পানাদা ওখানে কাজে লেগে পড়ে । আভার মা ওকে প্রথমে যেতে দিতে চায়নি, এত্তো বড় পশুর কাছে ।

বলতো :: **যখন ছোট ছিলো ও, তখন হাতিও বাচ্চাই ছিলো । এখন সে পাহাড় প্রমাণ । পানাদাকে এক জখমেই, খতম্ করে দিতে পারবে ।**

কিন্তু আভার বাবা ঘাসিলিং আর পানাদা নিজেও মন্দিরে যাবার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলো বলেই শেষরক্ষা হলনা ।

একদিন শুভ না অশুভ লগনে পানাদা চলে গেলো মন্দিরে । প্রথমদিকে ভালই ছিলো । পরে গাঁজার

নেশায় ধরে । ততদিনে আভার বাবা শিকারের নেশা ছেড়ে পোচারের কাজ শুরু করেছে । অর্থাৎ চোরাশিকারি । এতে অনেক পয়সা হয় । একই শিকার করে **অনেক অনেক** টাকা লাভ হয় । বর্ডার পার করার অন্য লোক আছে । তাদের অনেকেই সমাজের ওপরতলার মানুষ ও বাউন্সার ।

জলের মতন টাকা আসতে থাকে ওর বাবার চোরা কুঠুরিতে । খালি মদ আর পশুহত্যা । এইভাবেই চলতো জীবন । মা আলাদা হয়ে গেলো । পানাদা চলে গেলো মন্দিরে । ওরা সবাই ভিনদেশে , ক্রীতদাস হয়ে ।

আজকাল ক্রমবর্দ্ধমান মিডিয়ার দৌলতে তো নানান জিনিস দেখা যায় । সেভাবেই কোনো লোকমাধ্যমের কৃপায়, আভার বাবার নাম পৌঁছে যায় এক ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্ম মেকারের কানে । এইরকম দূর্ধর্ষ শিকারি ও বাউন্সারের জীবনের ওপরে সিনেমা করতে সেই মেয়ে বদ্ধপরিকর । বিদেশী মেয়ে, সোনালী চুলের **হারপারই** ওর বাবাকে একপ্রকার ফিরিয়ে আনে সভ্যতায় । তার জীবনের ওপরে সিনেমা করার বাসনা নিয়ে গেলেও, ফিরে আসে বিজয়িনীর হাসি হেসে ।

কারণ জীবনটা বদলে দিতে পেরেছে নায়কের ; সিনেমার বাইরে । ঘাসিলিং এখন এক সুস্থ সবল সাধারণ মানুষ । তার উচ্চাশা আর পালোয়ান গিরির নেশা তাকে ছেড়ে চলে গেছে ঠিক আভাদেরই মতন ।

পানাদা তো মন্দিরে কাজ করতেই ব্যস্ত । ছেলেটিকে ঠিক মতন পয়সা দিতো না মন্দির কমিটি । অতিরিক্ত পরিশ্রম করাতো । হয়ত তাই ও গাঁজা সেবন শুরু করে । ইউফোরিয়ার লোভে । সব ভুলে থাকা । বিষাদ রেণুর, পুষ্পে রূপান্তর !

হাতির সাথে ভালই সখ্যতা ছিলো পানাদার তবুও কোনো এক অশুভ লগ্নে সেই হাতির পদতলে পিষ্ট হয়েই নিহত হয় ছেলেটি । ভালোমানুষের পোর দেহটা, একটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলা পপকর্ণের প্যাকেটের মতন পড়েছিলো --লগ্নভ্রষ্ট মন্দিরে এক ব্রতচ্যুত ক্ষ্যাপা পশুর কারণে । দিনের পর দিন অসহ্য রোদে বাঁধা থেকে থেকে পশুটি ক্ষেপে ওঠে । নির্মম আঘাত হানে, শৈশবের সখার দেহে । পানাদার দেহটি ; ওর পালক পিতার কুস্তির কোপে পড়া কোনো মানুষের- ভগ্ন দেহাংশের মতন পড়ে ছিলো । একেই বুঝি বলে কর্মের বৃত্তাকারে ঘোরা । বাউন্সারের ; শুন্যে ছোঁড়া প্রতিটি ঘুষি বাউন্স করে, ফিরে এসেছে পুত্রের দেহে । হোক্ না পালিত পুত্র , আত্মজ তো বটেই !

হাতিকে নিয়ে গেছে বনবিভাগ । ওকে মেরে ফেলার কাজ পড়েছে আভার বাবার ওপরে । শিকারি হিসেবে আগে তো তার নাম ছিলো । এই ক্ষ্যাপাটে হাতির মুখোমুখি হতে কেউ রাজি নয় আসলে ।

সেদিনই বোধকরি সার্থক হল ঘাসিলিং এর শিকার । কে জানে !

ঘাসিলিং, ততদিনে গাছের কাঠ কেটে মানে কান্ডটা কেটে তার ভেতরটা চেঁচে নিয়ে, বড় বড় পাইপ নির্মাণের কাজে লেগেছে । ঐ অঞ্চলে এগুলি হয় । সেই কাঠের অংশ দিয়ে ওরা এক আজব ড্রাম মানে বাদ্যযন্ত্র বানায় । ওর বাবা ঐ ড্রাম তৈরির কাজ কিছুদিন করে । কিন্তু সুরেলা ড্রাম তাকে বাঁধতে পারেনি । কারণ আভার মায়ের ভাষায় **ঘাসিলিং তার স্বামী হলেও ছিলো আসলে এক অসুর !**

সুরের মূর্চ্ছণায় অস্বস্তি হত ঘাসিলিং এর । বুকে কষ্ট হত । কোনোদিন গান করেনি সে । গান টান মনে হত সময় নষ্ট আর কান্না । দূর্বল মানুষ ; গলা দিয়ে প্যানপ্যানে সব আওয়াজ বার করে বসে বসে- যাকে অনেকে গান আখ্যা দেয় ! আর ক্লাসিক্যাল গান মানে কতগুলো বুড়োবুড়ির বসে বসে, একগাদা ড্রাম নিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কনস্ট্যান্ট গলা কাঁপানো । অনেকটা বনের বাঁদরদের মতন ।

ঘাসিলিং এর জীবনদর্শন ভিন্ন । তাই তো সে পালোয়ান । দেহই তার মন্দির-মসজিদ্ ।

কাজেই শিকার গেলো, এলো চোরাশিকার, ড্রাম গেলো এলো নৌকো । ওদিকে বাঁশ দিয়ে একধরণের নৌকো তৈরি হত যা দেখতে কিছুটা বাটির মতন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটি ! এই জনা চারেক সওয়ারি বসে ওতে, মাঝি ছাড়া । সেই নৌকো নির্মাণের কাজ নিয়ে তীরে তরী বাঁধলো ঘাসিলিং । স্রেফ ঐ মহিলা ফিল্মমেকারের পাল্লায় পড়ে ! জলস্রোতে যখন টাট্কা নৌকোগুলি ভাসতো তখন ভীনদেশী যুবতী হারপারের মনে হত যে সিনেমার অশেষ ক্ষমতা । সিনেমা কেবল বিনোদন নয় রূপালী এই ঢেউ মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে । এক যন্ত্রমানবকে করে তুলতে পারে স্পর্শকাতর ।

বাউন্সারকে, সেন্সিটিভ এক মানুষ । যে একটি ঘাসপোকাও আর টিপে টিপে মারবে না । কোনো দিনই । ঘাসিলিং আজ ঘাস হয়ে গেছে । সতেজ ঘাস । তাই বুঝি ঘাসপোকার বেদনা সে বোঝে । ঘাসজীবনের কথাকলি রচনা করে- এই শক্তিমানের অমল মন ।

ছায়াছবি শুধু স্বপ্নের জগৎ নয় । এইধারা, ছায়ামানুষকে রক্তমাংসের মানবে পরিণত করতে সক্ষম । সত্যি , হারপারের জীবনই তার প্রমাণ । অনেকটা আমাদের ছায়াপুরুষ সাধনার মতন । নিজ ছায়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো । ধীরে ধীরে সেইছায়ায় স্বচ্ছতা আসবে , রং আসবে, আসবে থ্রি -ডায়মেনশান । মনে হবে নিজেরই ক্লোনের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি ! এই ক্লোনিং করতে সায়েন্স লাগেনা !

পাঠকের কী মনে হয় ? এখানে ঘাসিলিং এর চরিত্রে আর কী কী রং থাকতো ? কোন কোন জায়গায় তার রং চটে গেছে ? আমার মনে হয় পাঠকের নিজ কল্পনায়, ঘাসিলিং আরো জীবন্ত হবে । আরো সাবলীল । এমন কোনো ঘাসিলিং যার সঙ্গে কোনো কোনো পাঠক রিলেট করবেন । কাছের মানুষ বলা যাবে হয়ত । আমি পাঠকদের কাছে মিনতি করছি , ঘাসিলিং এর কথা আমাকেও একটু শোনান , কোন সুরে বাজছে তার বাঁশের বাঁশি ? পাঠকের অবচেতনে ?

যাকে **পানাদার মা** বলে লোকে সন্দেহ করতো সেই মহিলার নাম ছেল্লম্ । সে এক অদ্ভূত মহিলা । তার সারাদেহে কোথাও বিন্দুমাত্র সততা নেই ।

এক আজব খিচুড়ি রেঁধে এনে, তাও ফুটপাথে বসে বসে , ঘাসিলিংকে জোর করে রোজ খেতে দিতো । বলতো : : **না খেলে আমি আত্মহত্যা করবো ।**

সেই অখাদ্য খেয়ে খেয়ে ঘাসিলিং এর এখন তখন অবস্থা হত । কারণ ভোজন করার জন্য উপাদেয় তো নয়ই আর স্বাস্থ্যকরও নয় । অর্ধসেদ্ধ চাল ও ডালে মেলানো এক জগা-খিচুড়ি যার মধ্যে তেতো সবজি ও শক্ত আলু দেওয়া । কখনো তার সাথে আসতো বেগুনের বোঁটার সবজি । সেও অখাদ্য আর অর্ধপাক করা । ঘাসিলিং খেয়ে নিতো কেন, কেউ জানেনা হয়ত মনে রসের সঞ্চার হয়েছিলো এই কুরূপা নারীর জন্য । আভার মায়ের সাথে রোজই ঝগড়া হত শিকার নিয়ে । তখনই **ছেল্লম্ স্টেজে নামে** একেবারে অখাদ্য কুখাদ্য নিয়েই ! আসলে খুব ক্ষিদে পেলে তখন মনে হয় যে যা খাচ্ছি তাই অমৃত ! সেই লজিক হয়ত- ছেল্লম্ এর প্রতি টানের , ঘাসিলিং এর । তবে এই সম্পর্কই পানাদার সৃষ্টি করেছে কিনা সেই বিষয়ে লোকে

কানাঘুষো করলেও একমাত্র **ডিএনএ** টেস্টই বলতে পারবে এই তথ্য ঠিক না বেঠিক ।

ঘাসিলিং এর বীর্যপাত, বনপথে- সে এক পাগলাঝোরার কিনারায় । সেই বীর্য নিয়ে তন্ত্রমন্ত্র করে তা থেকে পানাদার আবির্ভাব । এইসব গবেষণা আর বিজ্ঞানের বিষয় । সমাজের কাজ কুৎসা রটানো । আর আসল সত্য জানে কেবল ঘাসিলিং আর ছেল্লম্ ।

ঘাসিলিং তো পালোয়ান হওয়ার সময় থেকে প্রচুর কলা খেতে অভ্যস্থ কাজেই ছেল্লম্ তাকে অনেক কলা পেড়ে এনে খাওয়াতো । ছেল্লম্ আবার ওদের এলাকার পুরুষদের সাথে, পয়সার বিনিময়ে শুয়ে পড়তো তবে একে কেউ বেশ্যাবৃত্তি বলেনা । যেসব পুরুষ একা, তারা ছেল্লমের মতন নারীকে ভাড়া নিয়ে কয়েকঘন্টা শুতে পারে তবে সাথে লোক থাকে । নারীটি কেবল পুরুষের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে অভ্যস্থ । একে ওরা বলে সুইয়াল্ । ছেল্লম্ এই সুইয়াল্ এর কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করতো আর দিনের বেলায় বনে জঙ্গলে ঘুরে, পক্ষীশাবক খুঁজে নিয়ে তাকে বড় করে জ্যোতিষ করতো । একটা খাঁচা বানিয়ে সেখানে বুনো পাখি ভরে ভাগ্য বলতো । পাখিটি এসে দানা খুঁটে খেতে খেতে একটি বিশেষ দানায় মুখ

দিলেই সৌভাগ্য আর নাহলে দূর্ভাগ্য এইভাবে কপাল পড়া হত । লোকে, নিতান্তই মূর্খ নাহলে বুঝতো যে এগুলি লোকঠকানো ভাগ্যগণনা । তবুও কিছুটা দয়াতেই তারা ছেল্লম্‌কে পয়সা দিয়ে যেতো ।

--আহা রে , গরীব মেয়েমানুষ ।

ছেল্লম্ কে দুটি প্রশ্ন করলে একটির জবাব দিতো ।

আর অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে পারতো ।

পানাদা তারই গর্ভজাত সন্তান কিনা জানতে চাইলে কাউকে বলতো হ্যাঁ , কেউ শুনতো না আবার কেউ জানতো যে হতেও পারে ।

পানাদা হাতির পদপিষ্ট হবার পরই ছেল্লম্ ওর পোষা পাখিগুলিকে উড়িয়ে দেয় । ভাগ্যগণনা বন্ধই করে দেয় একেবারে । শুধু সুইয়াল্ কাজের মাধ্যমে নিজের জীবন চালিয়ে যেতে থাকে । লোকের মাথায় হাত বোলানো । অর্থের বিনিময়ে । আসলে সবারই কাছের মানুষ হারিয়ে গেছে । তাই গায়ে মাথায় হাত বুলাবার কেউ নেই । আজকাল সেটাও পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে ।

তাতে সুবিধে হচ্ছে ছেল্লমের মতন মহিলাদের । অর্ধ মানবী হয়ে কাজ করছে তারা ।

ঘাসিলিং আর ছেল্লম্ কোনোদিনই বিবাহ করেনি । আসলে ওরা একে অপরের প্রেমাস্পদ ছিলো কিনা তাও কেউ জানেনা । ওরা একজন অন্যজনকে খেতে দিতো, সাহায্য করতো ইত্যাদি ।

সেই সম্পর্কের গোড়ার কথা কেউ জানেনা ।

আর পানাদা মারা যাবার পর ছেল্লম্ খুব কান্নাকাটি করতো । পাখিদের উড়িয়ে দেয় মুক্ত আকাশে ।

জীবনটা একেবারে ভিন্নপথে চালিত করে ।

মিথ্যে কথা নাকি একেবারেই বলতো না । অতিরিক্ত সত্যের বোঝা বইতে বইতে মাথা খারাপও হয়ে যায় কিঞ্চিৎ । শেষদিন অবধি অবশ্য ঘাসিলিং সঙ্গেই ছিলো । ছায়ার মতন ।

আভা চো-র বাবা ঘাসিলিং এর এইরকম জীবন ছিলো ঠিক । জীবনের বল্কল ছিলো সতেজ আর মজবুত ।

শেষ সময়ে স্বীকার করে গেছে যে পানাদা ওরই সন্তান । আর তার মা ছেল্লম্ নয় । হারপার তার আসল মা । কিন্তু শিশু অবস্থায় হাতি নয়, মানুষ করেছে ছেল্লম্-ই

। পরে আভা চোয়ের মা । হারপারের ফিল্ম করার সময় নয় আরো বহু আগে ওদের ঘনিষ্ঠতা হয় । হারপার তখন ছাত্রী । বিশ্ব ঘুরতে বেরিয়েছে । ওকে আকৃষ্ট করে ঘাসিলিং এর সাহস, পৌরুষ, ম্যাচো স্বভাব । হারপারের মনে হয় এমন একজনের সঙ্গ পাওয়া লাকের ব্যাপারে । আর অনেক সাদা মেয়েই যা করে তাই করেছে হারপার । প্রেমিকের শয্যা নিয়মিত ভাগ করেছে । গর্ভপাত করাতে উদ্যত হলে ঘাসিলিং বাচ্চাটাকে রাখতে বলে আর জন্মাবার সাথে সাথে ছেল্লম্‌কে দিয়ে আসে । গল্প বা সত্য এইটুকুই ।

আভা চো তো এখন মৃতা । খুন হয়েছে হঠাৎ !

তাকে কবর দেওয়া হবে । পোড়ানো হবেনা । কারণ তার মন পোড়ে আগুনের লেলিহান শিখায় । দেহ পোড়েনা । কিন্তু কে ওকে খুন করলো ? কোনো পুরনো , লুকানো শত্রু ? ওর বাবা, মা কিংবা পতিদেবের ?

গুলমোহর গাছ রূপী গুলনার খুব হেসে ওঠে । তারপর বলে : : **আধুনিকা , ধরতে পারলে না তো ?**

ওকে খুন করেছে ওর একাকীত্ব ! লোনলিনেস্‌ ।

তোমাদের স্বার্থপর, ভোগবাদের সমাজের বিযুক্ত মানুষ। যারা ওর জীবনে লোনলিনেস্ নিয়ে এসেছে।

ও কেন পরিবার ত্যাগ করে এসেছিলো জানো ? কারণ ওখানে সবাই পুতুল। কেউ মানুষ নয় !

ওরা আভিজাত্যের দাস , ধনসম্পদের নেশায় উন্মাদ। ওদের আবেগ নেই। লজ্জা নেই। ওরা কাঁদেও না। পাছে মেক আপ চটে যায় !

আমি দেখলাম যে আভার মৃত শরীর থেকে উঠে এলো আরেক আভা ! সে তার স্বপ্নের আভা। নিজেকে সে যে আকারে দেখতে চেয়েছিলো। এই ঘৃণ্য জীবন তো সে চায়নি ! কেউই বা চায় ? ঘৃণা আষ্টেপৃটে ধরে।

আভার দিদিমা নিজের চুল বিক্রি করে খেতো। পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা চুল ছিলো তার। সেই চুল দিয়ে পরচুলো হতো। তারপর ওর মা গেলো চুরুটে। ওখানে মেয়েরাও হুইস্কি পান করে , ভাত পচানো মদ খায় আর চুরুট ও সিগারেট খায়। দিদিমা আর মা দুজনেই খুব চুরুট খেতো। মদ খেতো। মা শেষদিকে একদম খাবার খেতো না , চিন্তায়। খালি স্মোক করতো।

আভা ওর মাকে **<u>লোটাস্ উইভার</u>** হিসেবে দেখতে চায় । পদ্মফুলের ডাঁটির ভেতরে যে সুতো থাকে তাকে টেনে বার করে কাপড় বোনা হয় ওদের দেশে । সেই ব্যবসায় ওর মা **মাইক্রো ফাইনান্স** নিলে ওর ভালো লাগতো । ও দেখছে ওর মা লোটাস্ উইভার হিসেবে কাজ করছে । ওদের ভাইবোনেদের ক্রীতদাস হতে হয়নি কারণ মায়ের ব্যবসা একদম জমজমাট !

ওদের দেশে লোকে মুখে রং মেখে ঘোরে । আমরা যেমন পাওডার লাগাই সেরকম করে ওরা দুই গালে , কপালে আর থুতনিতে রং মাখে । তবে ওদের রং কিন্তু কেমিক্যাল নয় । গাছের ছাল, ফুলে পাপড়ি আর বিভিন্ন ফলের সমাহার ঐ ভেষজ রং । এগুলি চামড়ার জন্য খুব ভালো । দেখতেও ভালোলাগে । এক একটি রং এক এক রকমের এনার্জি দেয় । লাল মানে তেজ, সবুজ হল শান্তি, হলুদ মানে বন্ধুত্ব আর সাদা মানে নির্মল মন । তবে কালো কেউ লাগায় না । ওটা অশুভ । কিন্তু ওদের ওখানে নাকি কালো বিড়াল শুভ ।

আভা দেখছে যে ওর কাঙ্খিত আভা নাম্নী নারী মুখে নানান রং মেখে পথে ভাসছে । এই আভা কাপড়ের পুতুল বানায় । ওদের দেশে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির খুব চল । বিশেষ করে উইভিং আর ক্রাফ্ট । ওরা সবাই প্রায় ভাঙা ভাঙা ইংলিশে কথা বলতে পারে এত বিদেশি

আসে ওখানে । কাজেই আভার দেহ থেকে সোনালী আভা বার হচ্ছে । ও পুতুল বানায় । হরেক রকমের কাপড়ের পুতুল । সেই কাপড় বোনে ওর মা ---! লোটাস্ উইভিং । ওর ভাইবোনেরা সবাই ওদের ব্যবসায় সাহায্য করে । ওদের এত বড় ব্যবসা হয়েছে যে ওরা এখন মাইক্রো ফাইনান্স এ ভাগ নেয় । লোন দেয় নতুন ব্যবসাদার ও ছোট ব্যবসায়ীদের ।

ওরা কেউ প্রাণঘাতী চুরুটের সাথে যুক্ত নয় ।

আর মুখে রং মেখে বার হলে কালার থেরাপিও হয় । নয়নের আরাম হয় , মন ঠান্ডা হয় । ওরা সবাই মুখে রং চং মেখে হাঁটছে , জনমানবহীন রাজপথে ।

ওর বাবা শিকার করেনা । ওর বাবা এখন দেখা যাচ্ছে ওদের **গ্রাম সাফের** কাজে নিযুক্ত । ওদের গ্রামে কেউ ময়লা ফেলে পথঘাট নোংরা করছে না আর । সবাই **মার ঝাড়ু মার** করে ময়লা তুলে নিচ্ছে । ওর বাবা সেই সংগ্রামের নেতা । ওরা বাউন্সারের কাজ করলেও ওর বাবা **সাফাইকর্মী** হয়ে আছে । শুকনো, ঝরাপাতা, কাঠকুটো যাচ্ছে সারে আর ভাতের ফ্যান , অভুক্ত খাদ্য বা সবজি পথপাশ থেকে চলে যাচ্ছে কোনো ক্ষুধার্ত পশুর খাদ্য গহ্বরে ।

ওর বাবা সমাজ গড়ছে এখন , ভাঙছে না ।

আর আভার স্বামী একজন অধ্যাপক । যিনি ওদের গ্রামে ঐ সাফাই প্রথা চালু করেছেন । ওটাকে বড় আকার দেয় ওর বাবা , বাবা বড় কিছু করবেই !

লোকটাকে সবাই পাগলা বলে । ক্ষ্যাপা ধরণের । রাস্তা থেকে ময়লা তুলে তুলে নিয়ে যেতো । এমন সাফ করার বাসনা । হাইট বেশ কম । চোখে পুরু চশমা । আধময়লা পোশাক আশাক । লোকটা খালি ডোনেট করে আর মানুষের উপকার করে । নিজের জন্য কোনোদিন কিছু করেনি । আভা ওর গলায় বরমাল্য দিচ্ছে । বিষ ব্যবসাদারের গলায় নয় !

সবাই ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছে :: **ওরে শেষপর্যন্ত এক পাগলাকে বিয়ে করলি ?**

শুনে শুনেও আভা হাসছে । খুব হাসছে । মনে মনে বলছে :: সবাই তো পাগল ! কেউ বেশি পাগল কেউ কম পাগল । কোনো পাগল চেনে বাঁধা থাকে আর কেউবা ঘুরে বেড়ায় , হেথায় সেথায় ।

আর কি ? আর হারপারে গর্ভজাত ওর ছোট্ট ভাই পানাদা, পরিত্যক্ত শিশু নয় ! আধুনিক যুগে ওকে গর্ভ থেকে গর্ভে ট্রান্সফার করা হয়েছে । **ফ্রম হারপার, টু ছেল্লম্ এর গর্ভে ট্রান্সফার । ভ্রূণ সংযোজন !**

আভার ; কল্পিত আভার ছটায় নিজেকে দেখার চেষ্টা করছি !

আমার আভাটা , গার্গীটা কেমন হবে ? গার্গী ছায়া -- গার্গীর প্রতিবিম্ব ??

স্রষ্টারা বুঝি সৃষ্টির মায়াস্পর্শে একসময় নিজেরাই চরিত্র হয়ে যায় , তাই না ?

THE END